UG Second Sem.
Paper – CC3

রীনা পাল

সম্রাট অশোক (২৭৩–২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ঃ

ভারতীয় শাসকদের মধ্যে এক অতিবিশিষ্ট নাম হল সম্রাট অশোক। মৌর্য বংশের এই মহান সন্তান রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অভিনব নীতি অনুসরণ করেছিলেন, তা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর শাসনতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণে সহায়ক উপাদান হিসেবে আলোচিত হয়ে চলেছে। ঐতিহাসিক এইচ.ডি. ওয়েলস তাঁকে 'সমস্ত শাসকদের মধ্যে মহত্তম' বলে বর্ণনা করেছেন। বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকার হিসেবে নয়, একজন প্রজাকল্যাণকামী শাসন হিসেবেই তিনি অশোককে এই মর্যাদাপূর্ণ অভিধায় ভূষিত করেছেন।

প্রথম জীবন ও সিংহাসন লাভ ঃ বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক ছিলেন উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা। তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমনের কাজেও তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি যখন উজ্জয়িনীতে ছিলেন, তখন বিন্দুসারের মৃত্যু ঘটে (২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে)। সুতরাং ঐ বছরই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। দীপবংশ অনুযায়ী বুদ্ধদেবের মহাপরি-নির্বাণের ২১৪ বছর পর অশোক সিংহাসনে বসেন। প্রচলিত মতানুযায়ী ৪৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধের জীবনাবসান হয়। সুতরাং ৪৮৭–২১৪=২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকেই অশোকের সিংহাসনারোহণের বছর ধরা যায়। আবার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনারোহণের তারিখ হিসেবে ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে ধরা হয়।

কলিঙ্গ জয় ঃ পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নীতি অনুসরণ করে অশোকও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন। রাজ্যাভিষেকের নবম বৎসরে তিনি কলিঙ্গ জয়ে প্রবৃত্ত হন। বর্তমান কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলা নিয়ে কলিঙ্গরাজ্য গঠিত ছিল। তাঁর ত্রয়োদশ শিলালিপি, কলিঙ্গ লিপি, প্লিনির বর্ণনা ইত্যাদি থেকে কলিঙ্গ যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্লিনির রচনা উদ্ধৃত করে অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন যে, কলিঙ্গ একসময় নন্দ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে কলিঙ্গ রাজ্য স্বাধীন হয়ে যায় এবং কালক্রমে সচ্ছল ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমান্তে কলিঙ্গরাজ্যের অবস্থান সেই রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে বিবেচনা করে অশোক সেই রাজ্য আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। আবার ড. ভাণ্ডারকরের মতে, বিন্দুসারের সঙ্গে চোলগণের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে কলিঙ্গ চোল পক্ষে যোগ দিয়েছিল। ফলে বিন্দুসার ঐ যুদ্ধ জয়ে অকৃতকার্য হন। এরপর অশোক সিংহাসনে বসে পিতার অসমাপ্ত কা জসমাপ্ত করার মানসে কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। অশোকের কলিঙ্গ জয়ের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে কোশাম্বি, রোমিলা থাপার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করে থাকেন। তাঁদের এইরূপ ধারণার প্রধান ভিত্তি তিব্বতীয় বিবরণ। রোমিলা থাপারের মতে, দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী স্থল ও

জলপথগুলি ছিল কলিঙ্গের নিয়ন্ত্রণে। এগুলিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে এনে মগধের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা করাই ছিল অশোকের কলিঙ্গজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

কলিঙ্গ যুদ্ধ ঃ ড. রায়চৌধুরীর মতে, কলিঙ্গযুদ্ধ মগধ তথা ভারতের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। (The conquest of Kalinga was a great land-mark in the history of Magadha and of India)। বিম্বিসার কর্তৃক অঙ্গরাজ্য জয়ের মাধ্যমে যে মগধ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ঘটেছিল, কলিঙ্গজয়ের মাধ্যমে তা পূর্ণতা পেয়েছিল। অতঃপর কোন মৌর্যসম্রাট রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হন নি। ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে কলিঙ্গযুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ লেখ অনুযায়ী কলিঙ্গ যুদ্ধে দেড় লক্ষ মানুষ বন্দী হয়, এক লক্ষ মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং অনেক বেশি লোক বিভিন্নভাবে প্রাণ দেয়। যুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্লিনি কলিঙ্গের যে পরিমাণ সেনার উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য যুদ্ধে আহত ও নিহত সেনার সংখ্যা তার অনেক বেশি ছিল। সম্ভবত মধ্যবর্তী সময়ে কলিঙ্গ তার লোকবল বৃদ্ধি করেছিল। আবার ড. ভাণ্ডারকর মনে করেন, এই যুদ্ধে চোল ও পাণ্ড্যগণও কলিঙ্গের পক্ষে যোগদান করায় হতাহতের সংখ্যা এরূপ বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, যুদ্ধে কলিঙ্গ সেনা সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিদ্ধস্ত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে কলিঙ্গ একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতে থাকে, যার রাজধানী হয় তোষালী।

ত্রয়োদশ শিলালেখ ব্যক্তি-জীবনে যুদ্ধের প্রভাব ঃ ব্যক্তি-অশোকের উপর কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ত্রয়োদশ শিলালেখর বক্তব্য থেকে এ তথ্য পরিস্ফুট হয়। এখানে বলা হয়েছে — কলিঙ্গ রাজ্য বিজিত হবার পর রাজার মনে শোক ও সন্তাপ জাগ্রত হয়। একটি অবিজিত দেশ বিজিত হবার সময় সে বন্দীকরণ, হত্যা ো মৃত্যু অনুষ্ঠিত হয়, তা তাঁকে গুরুতর ভাবে আহত করে। সর্বত্রই ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ এবং গৃহস্থগণ বাস করেন। এঁদের মধ্যে মানবিক গুণসম্পন্ন (পিতামাতার প্রতি ভক্তি, মিত্র পরিচিত, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদয় আচরণ) বহু ব্যক্তিও থাকেন যুদ্ধজনিত কারণে যাঁদের স্বজনবিয়োগ, নির্বাসন ইত্যাদি আঘাত সহ্য করতে হয়। সকলের এই দুর্ভাগ্য রাজা গুরুতরভাবে অনুভব করেছিলেন। সুতরাং, আহত, নিহত, মৃত ও বন্দীকৃত মানুষের সংখ্যা যাই হোক না কেন তার শত বা সহস্রভাগের একভাগ মানুষও যদি অনুরূপ দুঃখ ভোগ করে তবে রাজা মর্মাহত হবেন। লেখটিতে আরো বলা হয়েছে যে, কলিঙ্গ রাজ্য বিজিত হবার পর ধর্মের অনুশীলন, ধর্মপ্রাণতা ও ধর্মাচরণের নীতি রাজার দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। অর্থাৎ কলিঙ্গ যুদ্ধের বীভৎসতা অশোকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ও অনুতপ্ত অশান্তহৃদয় রাজাকে

ধর্মানুশীলনের পথে প্রবৃত্ত করেছিল। তাঁকে প্রকৃত অর্থে ক্ষমাশীল ও মানবদরদী করে তুলেছিল। মানসিক শান্তিলাভের আশায় তিনি বুদ্ধের অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব ঃ কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের রাষ্ট্রনীতির উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অতঃপর তিনি রাজনীতি হিসেবে যে তত্ত্ব প্রচার ও অনুসরণ করেন, তা এককথায় অভিনব। এই পরিবর্তিত নীতির প্রধান অঙ্গ হিসেবে তনি জনগণের কাছে রাজার ঋণ স্বীকার করেন ও সুষ্ঠুভাবে রাজকর্তব্য পালনের মাধ্যমে সেই ঋণ পরিশোধের প্রচেষ্টায় রত হন। যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যজয়ের নীতি পরিত্যক্ত হয়। পরহিত ও ধর্মানুশীলনের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করার নীতি গৃহীত হয়। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই পরিবর্তিত নীতির মধ্যেই অশোকের মহত্ত্ব নিহিত আছে। এ.কে. মজুমদারও এই কারণে কলিঙ্গ যুদ্ধকে ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্ন বলে মন্তব্য করেছেন। কলিঙ্গ যুদ্ধ পরবর্তী পরিবর্তিত রাষ্ট্রনীতি অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। অহিংস বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ফলে অশোকের ব্যক্তিগত অভ্যাস বা রাজকীয় প্রথাগুলিও নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। বিহারযাত্রা (প্রমোদ ভ্রমণ) পরিবর্তিত হয়েছিল ধর্মযাত্রায়। দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ হয়েছিল। আগে রাজকীয় রন্ধনশালায় যে বিপুল পরিমাণ প্রাণীহত্যা করা হত, তাও একেবারে কমিয়ে আনা হয়েছিল। ভেরীঘোষ (যুদ্ধের দামামা) পরিবর্তিত হয়েছিল ধর্মঘোষে। অশোক অনুভব করেছিলেন যে, রাজার প্রধান কর্তব্য প্রজাদের ও জীবকুলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করা। ইহলৌকিক মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কূপখনন, বৃক্ষরোপণ, মানুষ ও পশুদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, জীবহত্যা নিষিদ্ধকরণ, বন্দীদের মুক্তিদান, মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনদিনের অবসরদান ইত্যাদি ছিল এই কর্মসূচীর অন্তর্গত। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও তিনি বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। রাজুক, যুত প্রমুখ কর্মচারীদের পাঁচ বৎসর অন্তর রাজ্য পরিক্রমায় বের হতে নির্দেশ দেন। প্রজাদের কোনরকম অনিষ্ট হচ্ছে কিনা, তা জানার জন্য 'প্রতিবেদক' নামক বার্তাবহ নিযুক্ত করেন। প্রজাদের পারলৌকিক উন্নতিবিধানের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন। তাদের ধর্মানুসরণের প্রতি নজর রাখার জন্য 'ধর্মমহামাত্র' নামক কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। প্রচলিত উৎসব অনুষ্ঠানের পরিবর্তে এমনসব উৎসবের আয়োজন করেন, যা সাধারণের মনে ধর্মভাবনা জাগ্রত করে। অশোক শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিতে ধর্মের বাণী খোদাই করান। বৌদ্ধ ছাড়াও ব্রাহ্মণ, আজীবিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের

কল্যাণের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে নিজের কাজের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রচালিত 'সকল মানুষই আমার সন্তান' (সব মুনিষে পজা মমা) এই বাণীকে মূর্ত করে তোলেন।

পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন ঃ পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, অশোক সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। যুদ্ধের বীভৎসতা তাঁকে এতদূর কাতর করে যে – তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর পুত্র বা প্রপৌত্ররাও কেউ যেন আর যুদ্ধনীতি গ্রহণ না করে। যুদ্ধনীতি যে তিনি সত্যসত্যই ত্যাগ করেছিলেন, তার প্রমাণ সীমান্তবর্তী চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে জয় করার কোন উদ্যোগ তিনি নেন নি। এমনকি ঐ রাজ্যগুলিকে এই আস্বাসও দেন যে এখন থেকে তিনি তাদের দুঃখের কারণ হবেন না। এইভাবে দিগ্বিজয় নীতি ত্যাগ করে তিনি ধর্মবিজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর পরিবর্তে তিনি নানা দেশে প্রেরণ করেন ধর্মপ্রচারকদের। তাঁরা নানা দেশে ছড়িয়ে দেন অশোকের অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী।

বিরুদ্ধ মত ঃ অশোকের জীবন ও নীতিকে কলিঙ্গ যুদ্ধের উপরিলিখিত প্রভাবকে কেউ কেউ অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন। রোমিলা থাপারের মতে, অশোককে যতখানি শান্তিবাদী শাসক বলে মনে করা হয় তিনি তা ছিলেন না। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা যদি সত্যিই তাঁর মানসিক পরিবর্তন সাধন করতে তবে তিনি কলিঙ্গের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। যুদ্ধনীতি ত্যাগ করলেও যুদ্ধবর্জনের শর্ত হিসেবে সেনাবাহিনীকে ভেঙ্গে দেন নি বা সংখ্যা হ্রাস করেন নি। তাই রোমিলা থাপার অশোকের যুদ্ধনীতি ত্যাগের অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, মৌর্য সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনের যে দায়িত্ব সম্রাট হিসেবে অশোকের ছিল, তা কলিঙ্গ জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ হয়ে যায় ও এইজন্যই অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে তিনি যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করেন। রামশরণ শর্মার মতেও, কেবলমাত্র কলিঙ্গ যুদ্ধের বীভৎসতাই অশোককে অহিংসা ও শান্তির পূজারী করে গড়ে তোলে নি। বরং শান্তিনীতির দ্বারা মৌর্য সাম্রাজ্যকে সুসংহত রাখা সম্ভব হবে – এই চিন্তাই তাঁকে শান্তিবাদী করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী (D.D. Kosambi) তাঁর 'এ্যান ইনট্রোডাকসন টু দ্য স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী' শীর্ষক গ্রন্থে অশোকের কলিঙ্গনীতির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুটি দিক থেকে তিনি অশোকের নীতির বাস্তবতা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত, অশোক এই সত্য অনুধাবন করেছিলেন যে, সমাজ ও অর্থনীতির বস্তুগত ভিত্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বৈদিক যুগের পশুচারণভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমশ পিছু হটে কৃষি উৎপাদন ভিত্তিক দৃঢ় ও অগ্রণী অর্থনীতিকে স্থান করে দিচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বাণিজ্যিক লেনদেনের উৎসাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে

পারস্পরিক নির্ভরশীল অর্থনীতির সূচনা করেছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় যুদ্ধ নয়, শান্তিই ছিল আর্থিক স্থিতি ও সামাজিক সচলতার প্রধান শর্ত। তাই বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ তাঁর কাছে অবান্তর প্রতিভাত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অশোক বুঝতে পেরেছিলেন যে গাঙ্গেয় পূর্ব-ভারতের অর্থব্যবস্থা দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে দীর্ঘকাল তাল রাখতে পারবে না। গাঙ্গেয় অঞ্চলের ঘনবসতি কৃষিক্ষেত্রকে দ্রুত সংকুচিত করছিল। উৎপাদনেও ঘাটতি বাড়ছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ-ভারতে ঘনবসতি না থাকায় কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত ছিল। উর্বরতাও কম ছিল না। সর্বোপরি, অন্ধ্র ও মহীশূরে নতুন লৌহখনির আবিষ্কার ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে নবজীবন দিয়েছিল। তামিল অঞ্চলে ছাড়া দক্ষিণ-ভারত তাঁর দখলে থাকায় দূরদর্শী অশোক অতঃপর সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তে সংহতি-সাধনের কাজে লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন। এখানেই অশোকের অনন্যতা। রুশ ঐতিহাসিক বনগার্ড লেভিন অশোকের পরিবর্তিত পররাষ্ট্রনীতি অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এক্ষেত্রেও অশোক বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন। কূটনৈতিক জ্ঞানের দ্বারা তিনি অনধিকৃত রাজ্যগুলিতে নিজ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। ঐ সব দেশকে তাঁর জনকল্যাণকামী কর্মসূচীর আওতায় এনে, ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে ও সহৃদয় আচরণ করে তিনি নিজ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। অর্থাৎ একমাত্র ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অশোক তাঁর জনকল্যাণকামী আদর্শকে রূপায়িত করেন। যাই হোক, উপরিলিখিত যুক্তিগুলি স্বীকার করে নিলেও একথা সত্য যে, কলিঙ্গ যুদ্ধের একটা বিরাট প্রভাব অশোকের জীবনে পড়েছিল এবং তাঁর মানসিক পরিবর্তনকে নিশ্চিত করেছিল।

অশোকের সাম্রাজ্য ঃ অশোক কলিঙ্গজয়ের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির পরিসমাপ্তি ঘটান। তাঁর পরবর্তী কোন মৌর্যরাজ্যও সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন নি। তা সেই ষোড়শ মহাজনপদের যুগ থেকে মগধকে কেন্দ্র করে যে বিস্তার নীতির সূচনা হয়েছিল অশোকের রাজত্বকালেই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। এই কারণে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি নির্ধারণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। অশোকের কোন লেখ থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না, যদিও চতুর্দশ লেখতে তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর সাম্রাজ্য সুবিস্তৃত। অশোকের সাম্রাজ্য নির্ধারণের সহজতর উপায় হল চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সাথে কলিঙ্গ রাজ্যটিকে যুক্ত করা। কারণ অশোক কলিঙ্গ ছাড়া কোন রাজ্য জয় করেন নি। তবে স্বাধীনভাবেও তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি নির্ধারণ করা যায় ও একজন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। যথা – (১) অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলেখগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, (২) তৎকালীন স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ, (৩) ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শিলালেখর বিবরণ, (৪) কল্হণের রাজতরঙ্গিনী ও হিউ-এন সাঙ-এর বিবরণ প্রভৃতি।

অশোকের শিলালিপিগুলি সাধারণত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাতেই ছড়িয়ে ছিল। তাই ঐ লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকে তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে, উত্তর-পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে কতখানি বিস্তৃত ছিল তা নিরূপণ করা যায়। উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যের আম্বালা জেলা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তার প্রমাণ তোপরায় প্রাপ্ত স্তম্ভলেখ। হিউ-এন-সাঙ-এর বিবরণ ও রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীর তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কারণ রাজতরঙ্গিনী অশোককে 'কাশ্মীরের রাজা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বে তরাই অঞ্চল পর্যন্ত অর্থাৎ নেপাল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি জানা যায় নিগালীসাগর ও রুমিনদেই স্তম্ভলিপি থেকে। হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অঞ্চল যে অশোকের অধীনস্থ ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কালসীতে প্রাপ্ত অশোকের একটি শিলালিপি থেকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে আফগানিস্তানের জালালাবাদে ও তক্ষশীলায়। গ্রীক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, মৌর্য সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উল্লেখিত লেখ দুটি এই সত্যকে প্রমাণ করে। অশোকের সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্বে অন্তত ধৌলী ও জৌগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কারণ ঐ দুই স্থানে তাঁর দুটি লেখ পাওয়া গেছে। ঐ স্থানসহ সমগ্র কলিঙ্গই যে তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারণ ত্রয়োদশ লেখ থেকে তাঁর কলিঙ্গ জয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বে বিহার তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবত তারও পূর্বে বাংলাতেও তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলায় তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আমাদের মূলত হিউ-এন-সাঙের বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়। হিউ-এন-সাঙ বলেছেন যে, তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুব্রণ ও মেদিনীরু জেলার তাম্রলিপ্ততে অশোক নির্মিত কয়েকটি স্তূপ দেখিয়েছেন। যদিও ঐ দুই অঞ্চলে কোন স্তূপ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। অনেক ঐতিহাসিক মহাস্থানগড় লিপিকে অশোকের সময়কালীন বলে মনে করেন। তা যদি হয় তবে বঙ্গের কিছু স্থান অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে মনে ক রা যেতে পারে। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড়ে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত মৌর্যযুগের কিছু নিদর্শনও বঙ্গদেশে মৌর্য আধিপত্যের সাক্ষ্য বহন করে। পশ্চিমে তাঁর সাম্রাজ্য আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কারণ গুজরাটের জুনাগড়ে ও মহারাষ্ট্রের থানা জেলার সোপারায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাছাড়া শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখতেও মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র প্রদেশের শাসনকর্তা তুসাস্ফের নাম পাওয়া যায়। মহীশূরের মাসকী শিলালিপি ও মাদ্রাজের এড়াগুড়ি নামক স্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি অশোকের দক্ষিণে রাজ্যসীমা

নির্ধারণে সাহায্য করে। তাছাড়া দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ লিপিতে উল্লেখিত 'প্রাপ্ত' রাজ্যগুলির অবস্থান থেকেও বোঝা যায় যে, অশোকের রাজ্যসীমা দক্ষিণে পেন্নার নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সীমান্তবর্তী জাতিসমূহ ঃ অশোকের উৎকীর্ণ দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে তাঁর সাম্রাজ্যসীমা জানা যায়। এগুলিতে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েকটি জাতির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন – যবন, কম্বোজ, গান্ধার, ভোজ, রাষ্ট্রিক, অন্ধ্র প্রভৃতি। যবন বলতে সম্ভবত গ্রীকদের বোঝানো হয়েছে। এরা ছিল বর্তমান কান্দাহারের অধিবাসী। কম্বোজগণ ছিল কাশ্মীর-এর নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। গান্ধারদের বাসস্থান ছিল তক্ষশিলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ভোজ ও রাষ্ট্রিকগণ ছিল মহারাষ্ট্র অঞ্চলের অধিবাসী। ত্রয়োদশ লেখর একটি অনুচ্ছেদের ভুল ব্যাখ্যার জন্য এদের দীর্ঘদিন অশোকের অধীন সামন্ত নৃপতি মনে করা হত। কিন্তু গিরণার-এ প্রাপ্ত এই লেখর একটি হৃত অংশের পুনরুদ্ধারের ফলে এই ধারণা ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন এদেরকে 'অশোকের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী প্রজা' বলে মনে করা হয়। র‍্যাপসনের মতে, এই জাতিগুলি অশোকের প্রজা ছিল না, তবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু ভাণ্ডারকরের মতে, এরা অশোকের অধীনস্থ প্রজা ছিল। এই পরস্পরবিরোধী মতের সমন্বয়সাধন করে ড. এইচ. সি. রায়চৌধুরী বলেছেন যে, এরা অশোকের প্রজাই ছিল, তবে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ লেখতে অশোক কয়েকটি প্রাপ্ত রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এগুলি ছিল তাঁর সাম্রাজ্যসীমার পার্শ্বস্থিত স্বাধীন রাজ্যসমূহ। যেমন – চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র, সত্যপুত্র প্রভৃতি। চোলরাজ্য ছিল দুটি। একটি ছিল ত্রিচিনপল্লীর নিকটে এবং অপরটি ছিল বর্তমান আর্কটে। পাণ্ড্যরাজ্যও দুটি ছিল বলে ধারণা, এগুলি ছিল যথাক্রমে মাদুরাই ও মহীশূর অঞ্চলে বিস্তৃত। কেরলপুত্রের বসবাস ছিল সম্ভবত দক্ষিণ কানাড়া, কুর্গ, মালাবার অঞ্চলে এবং সত্যপুত্রদের বসবাস ছিল উত্তর ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে। এগুলি সবই ছিল ভারতীয় রাজ্য। একটি অ-ভারতীয় সীমান্ত রাষ্টেরর উল্লেখ অশোকের লেখ থেকে জানা যায়। সেটি হল সিরিয়া। সম্ভবত অশোকের রাজ্য উত্তর-পশ্চিম হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এরপরেই ছিল সিরিয়া রাজ্য।

উপরিলিখিত তথ্যপ্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় যে, অশোকের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও উত্তর-পশ্চিমে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের ভাষায় ঃ "A single-writ of the Emperor ran from Peshwar to bengal, and from Kashmir to Mysore which never

happened in ancient India" তাই বলা চলে, অশোক তাঁর পঞ্চম ও ত্রয়োদশ শিলালেখতে নিজ সাম্রাজ্যকে যথাক্রমে 'সমগ্র পৃথিবী' ও 'বৃহৎ' বলে দাবি করেছেন, তা যথার্থ।

অশোকের ধর্ম ঃ মানবধররর্ প্রচারক ও অহিংস নীতির পূজারীরূপে মৌর্য সম্রাট অশোক ভারত তথা বিশ্ব ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কল্হনের রচনা থেকে জানা যায়, কলিঙ্গ যুদধের সময় পর্যন্ত অশোক শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের বীভৎসতা তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা, আতঙ্ক, বেদনা এ দুঃখই তাঁকে পরিবর্তিত করে ও শান্তির জন্য তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখতে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, কলিঙ্গ যুদ্ধের বীভৎসতা ও প্রাণহানি তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং হিংসার অবসানকল্পে তিনি মহামতি বুদ্ধের অহিংস ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ প্রধান শিলালখতে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি তাঁর গভীর অনুরক্তির কারণ বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। ভাব্রু লেখতে তিনি বৌদ্ধধর্মের বহু উচ্চারিত মন্ত্র বা বিশ্বাস ত্রিরত্ন অর্থাৎ – বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। বৌদ্ধদের কাছে পরম পূণ্যস্থান বলে বিবেচিত সকল স্থানেই তিনি বৌদ্ধ স্তূপ, স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মাণ করান। বুদ্ধের বাণী পাহাড় ও স্তম্ভের গাত্রে খোদিত করে, অহিংসা মন্ত্র জনসাধারণের কাছে প্রচার করে তিনি বৌদ্ধধর্মের সেবা করেন। এমনকি বৌদ্ধসংঘে মতভেদ দেখা দিলে তা দূর করার জন্য তিনি পাটলিপূত্রে বৌদ্ধ সম্মেলন বা বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন। সুতরাং তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার বিষয়টি বিতর্কের উর্দ্ধে।

বৌদ্ধ হবার কারণ ঃ ড. ডি.আর. ভাণ্ডারকর, রাধাকুমুদ মুখার্জী প্রমুখ অশোকের মানসিক পরিবর্তন ও অহিংস নীতির প্রতি আসক্তিকেই ধর্মান্তর গ্রহণের অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসবিদরা অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের আরো গভীরতর কারণ উপস্থাপিত করেছেন। এই মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন ডি.ডি. কোশাম্বী এবং রোমিলা থাপার। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কারণ হিসেবে গভীরতর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন ড. কোশাম্বী ও রোমিলা থাপা। কোশাম্বীর মতে, অশোকের সময়ে মৌর্যরাষ্ট্রে একটি দৃঢ় শ্রেণীভিত্তি রচিত হয়েছিল। শ্রেণী-সংঘাত এড়ানোর জন্য রাজা ও সাদারণ নাগরিকদের মধ্যে মিলনভূমি তৈরির হাতিয়ার হিসেবে অশোক এই বিশ্বজনীন ধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন। রোমিলা থাপার-এর মতে, মৌর্যযুগে সমাজব্যবস্থা ছিল বেশ জটিল। ঐ সময়ে ধনী বণিকশ্রেণী সামাজিক স্বীকৃতিলাভে সচেষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রেণীভেদের কঠোর নিয়ম প্রয়োগ

করে এই উত্থানকে রোধ করা সম্ভব ছিল না। তাই অশোককে হয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে ঐ ধর্মের কঠোর অনুশাসন দ্বারা বৈশ্যদের রোধ করতে হত অথবা কোন উদার ধর্মমত গ্রহণ করে সামাজিক ভেদাভেদ কমিয়ে ঐ পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে হত। বিচক্ষণ অশোক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অ-জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নেন। এই ধর্মমত গ্রহণ করে তিনি উদার গোঁড়ামি-বর্জিত জনগণের সমর্থনলাভে সচেষ্ট হয়েচিলেন। ধনী বণিকশ্রেণীর সমর্থন থাকায় তাঁর রাজনৈতিক ভিত সুদৃঢ় হয়েছিল।

ধম্ম ঃ বিভিন্ন লেখতে উৎকীর্ণ অশোকের 'ধম্ম' সম্পর্কিত ব্যাখ্যাকে। বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অশোকের 'ধম্ম' ও বৌদ্ধধর্ম এক নয়। এঁদের মতে, অশোক ব্যক্তিগতভা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন লেখতে তিনি ধম্ম সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম বলা চলে না। কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রধান অনুশাসনগুলি যথা – নির্বাণ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতির উল্লেখ তিনি করেন নি। এইসব পণ্ডিতের মতে, অশোক কিছু লেখতে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের কথা উৎকীর্ণ করেছেন এবং অন্য কিছু লেখতে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত বা উদ্ভাবিত 'ধম্মের' নীতি ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত 'ধম্ম' ছিল অশোকের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার ফসল এবং এটি ছিল তাঁর পক্ষে ব্যবহারিক, সুবিধাজনক ও নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বতন্ত্র আদর্শ। এঁরা অশোকের দ্বৈত সত্তার কথা বলেছেন। একটি ছিল ব্যক্তি-সত্তা, অন্যটি শাসক-সত্তা। ব্যক্তি অশোক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ও প্রচারক। কিন্তু রাজা অশোক ছিলেন স্ব-উদ্ভাবিত 'ধম্মের' প্রচারক।

ধম্মের নির্দেশ ও পালনীয় কর্তব্যসমূহ ঃ প্রজামাত্রই অশোকের কাছে ছিল সন্তানতুল্য। তাই তিনি তাদের নৈতিক উন্নতির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেন। প্রজাসাধারণের কাছে তাঁর ধম্মের বাণী যাতে বোধগম্য হয় এজন্য তিনি সহজ-সরল ভাষায় তাদের পালনীয় কর্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। 'ধম্ম'-প্রচারের মাধ্যমে তিনি প্রজাদের নৈতিক উন্নয়নে ব্রতী হন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর তৃতীয় শিলালেখতে। সেখানে তিনি পুণ্যকর্ম হিসেবে পিতামাতার কথা শোনা, বন্ধু, পরিচিত, আত্মীয়, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের প্রতি উদার আচরণ, অল্পব্যয় ও অল্প সঞ্চয়ের কথা বলেছেন। দ্বিতীয় ও সপ্তম স্তম্ভলেখতে অশোক ব্যক্তিজীবনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন প্রতিটি মানুষ দয়া করবে (দয়া), দান করবে (দান), সত্য কথা বলবে (সচে), শুচিতা মানবে (সোচয়ে), ভদ্রতা রক্ষা করবে (মাধবে) বহু সৎকর্ম করবে (বহুকয়ানে) ও চারিত্রিক কলুষতামুক্ত থাকবে (অপ

অশিনব)। তৃতীয় স্তম্ভলেখতে অশোক যে যে ভাবাবেগের কারণে চরিত্র কলুষিত হয় সেগুলিকে নির্দিষ্ট করেছেন। এগুলি হল – ক্রোধ, নির্দয়তা, আত্মগরিমা, ঈর্ষা, হিংস্রতা ইত্যাদি। যাতে চরিত্র কলুষিত না হয়, কিংবা দয়া-দান ইত্যাদি গুণগুলি প্রতিনিয়ত গৃহীপ্রজাগণ অনুশীলন করতে পারেন এজন্য তিনি কতকগুলি আচরণবিধি বা কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট করেন। এগুলি হল – (১) প্রাণীহত্যা না-করা (অনারম্ভ প্রাণানাম), (২) জীবিত প্রাণীর ক্ষতি না-করা (অভিহিংস ভূতানাম), (৩) গুরুকে শ্রদ্ধা করা (গুরুনাম অপচিতি), (৪) পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা (পিতরি-মাতরি শুশ্রূষা), (৫) অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয়ে (অপব্যয়তা, অপভাণ্ডতা), (৬) বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা (থৈর শুশ্রূষা), (৭) দাস ও ভৃত্যদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ প্রভৃতি। সপ্তম স্তম্ভলেখতে অশোক কতকগুলি সামাজিক নীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি হল জীবে হিংসা না-করা, নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অপরের ধর্মকে হীন চোখে না দেখা, মনের সংকীর্ণতা দূর করার জন্য অপর সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করা ইত্যাদি। তিনি কেবল উপদেশ দান করেই বিরত হন নি, ধর্মমহামাত্রদের ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য কাজ করার নির্দেশও দান করেছিলেন।

অশোক তাঁর দুটি লেখতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন। যেমন মহিলাগণের পুত্রসন্তান জন্মালে, বিবাহকালে বা কোন স্থানে যাত্রার পূর্বে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, অশোক তার নিন্দা করেছেন। এছাড়া তিনি যজ্ঞে পশুবলি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ব্যক্তির আচরণ সৎ নয়, তার নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অশোকের ধম্মের একটি প্রধান উপাদান হল অহিংসা। বিভিন্ন লেখতে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে বারেবারেই হিংসা বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে, প্রাণিহত্যা নিয়ন্ত্রিত করে, এমনকি বন পোড়ানোও নিষিদ্ধ পরে তিনি এই অহিংসা নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

ধম্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অভিজ্ঞতা ঃ অশোকের ধম্মের প্রকৃতি কি তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু পণ্ডিত মনে করেন যে, অশোক তাঁর ধম্মের অনুশাসনের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মেরই প্রচার ও প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। অর্থাৎ ধম্ম ও বৌদ্ধধর্ম আলাদা কিছু নয়। এ মতের প্রধান সমর্থক হলেন ড. ডি. আর ভাণ্ডারকর। তিনি তাঁর মতের সপক্ষে নানা যুক্তি উত্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, যেসব ঐতিহাসিকরা 'ধম্ম' ও বৌদ্ধধর্মকে পৃথক করে দেখেন তাঁরা স্মরণ করেন না যে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন দুটি বিভাগে বিভক্তি। এর একটি হল বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় আচরণবিধি ও দ্বিতীয়টি হল গৃহী-ভক্তদের পালনীয় আচরণবিধি। অশোক যেহেতু নিজে গৃহী ছিলেন ও বিশেষ

করে, যাদের মধ্যে তিনি ধম্ম প্রচার করছেন, তাঁর সেই প্রজারা ছিল গৃহী। সেহেতু তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুশাসনগুলিই তাঁর লেখর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বৌদ্ধধর্মে গৃহী উপাসকদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে যেসব ধর্মপুস্তকের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল দীঘনিকায়ের সিগালবাদ সুত্ত, যার অপর নামই হল 'গিহি-বিনয়'। এই সুত্ত পাঠ করলে দেখা যায় যে, যেসব উপদেশাবলী অশোকের ধর্মের বাণী হিসেবে বিভিন্ন লেখয় উৎকীর্ণ হয়েছে (পিতামাতার প্রতি ভক্তি, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয় বন্ধু পরিচিতের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ইত্যাদি) ঠিক সেই উপদেশগুলিই বুদ্ধদেব কর্তৃক সিগালের প্রতি উক্ত হয়েছে। অশোকের ধম্মের অন্তর্নিহিত গুণাবলী হিসেবে দয়া, দান, সচে, সোচয়ে, মাধবে, বহুকয়ানে ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়। দীঘনিকায়-এর 'লক্ষণ সুত্ততে' এগুলির উল্লেখ রয়েছে। অশোকের ত্রয়োদশ লেখয় উল্লেখিত ধম্মমঙ্গলের ধারণা এসেছিল সুত্ত-নিপাতের "মহামঙ্গলম সুত্ত" থেকে। অশোকের ধম্মকে যাঁরা বৌদ্ধধর্ম থেকে পৃথক করে দেখেন তাঁরা এই যুক্তি দেখান যে, উক্ত ধম্মে বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু অনুপস্থিত ও তার বদলে স্বর্গের উল্লেখ রয়েছে। ড. ভাণ্ডারকরের মতে, এতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বৌদ্ধধর্মে 'নির্বাণ' কেবলমাত্র ভিক্ষুদের জন্য সংরক্ষিত অধিকার। সাধারণ মানুষদের ধর্মপ্রাণ হবার পুরস্কার হিসেবে স্বর্গবাসের উল্লেখ স্বয়ং বুদ্ধদেবই একাধিকবার করেছেন। এইভাবে ড. ভাণ্ডারকর যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, অশোক প্রচারিত 'ধম্ম' ও বৌদ্ধধর্ম এক ও অভিন্ন।

বিরুদ্ধ মত ঃ যেসব ঐতিহাসিক উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রিস ডেভিডস, ফ্লিট, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়। রিস ডেভিড্স-এর মতে, অশোকের ধম্মকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। প্রকৃত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের যা করা উচিত অশোক তাঁর ধর্মে সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "অশোকের 'ধম্ম' বলে যাকে প্রচার করা হচ্ছে, তাকে ধর্ম না বলে নৈতিক অনুশাসন বলাই যুক্তিসঙ্গত।" (The aspect of Dhamma which he emphasised was a code of morality rather than system of religion.) আবার অনেকে ধর্মকে তাঁর রাষ্ট্রনীতির অংশবিশেষ হিসেবে দেখেছেন। বিভিন্ন লেখয় অশোক যে ধম্মের বাণী উৎকীর্ণ করেছিলেন ড. ফ্লিট তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, – "....not to prapagate Buddhism or any other particular religion, but to proclaim the determination of Asoka to govern his kingdom righteously and kindly is accordance with th duty of a pious king." এঁদের মতে, অশোকের ধম্ম ছিল তাঁর স্বকীয়

আবিষ্কার। এই ধম্ম ছিল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধ আদর্শের সুসমন্বয়ে গঠিত একটি নৈতিক নীতি-নির্দেশিকা। এই ধম্ম প্রচারের মাধ্যমে তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্কারসাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর ধম্মের নৈতিক আদর্শ ছিল ব্যক্তির সামাজিক আচরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এর দ্বারা তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এই উদার নীতিবোধের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে তিনি সমাজে এমন এক নৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে সব সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাস করতে পারে। সর্বোপরি তাঁর ধম্ম যদি বৌদ্ধধর্মের অনুলিপিই হত, তাহলে তিনি তা অবশ্য উল্লেখ করতেন, কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। ড. থাপার লিখেছেন, "অতীতের ঐতিহাসিকেরা অশোকের 'ধম্ম'কে বৌদ্ধধর্মের সাথে এক করে দেখেছিলেন এবং তাঁরা মনে করেন, অশোক বৌদ্ধধর্মকে সরকারিভাবে রাজধর্মে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অশোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে। 'ধম্মের' উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও মানুষের পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কিত একটি বিশেষ মনোভাব তৈরি করা। সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক কাজকর্মে মানবিকভাবের সঞ্চারই ছিল তাঁর ধম্মের লক্ষ্য।"[১]

যাইহোক, ব্যক্তিগতভাবে অশোক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল গভীর ধর্মীয় উদারতা। অন্য ধর্মমতকে তিনি বর্জন বা অগ্রাহ্য করতেন না। Hultach-এর মতে, অন্য যে-কোন ধর্মপ্রাণ হিন্দুরাজার মত অশোক তাঁর ধর্মাচরণে উদারতা প্রদর্শন করেছেন। ষষ্ঠ স্তম্ভলেখতে অশোক ঘোষণা করেছেন ঃ "রাজা সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।" দ্বাদশ শিলালেখতে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্তিবশত অন্য সম্প্রদায়কে দোষারোপ করে, সে পরিণামে নিজের সম্প্রদায়েরই ক্ষতিসাধন করে।" তাই তিনি সব সম্প্রদায়ের জন্যই মৈত্রী ও বাকসংযমের নির্দেশ দিয়েছেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, অশোকের ধম্ম সাফল্যলাভ করেনি। ধম্মের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূর করা যায় নি। ধর্মপ্রচারে তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহ অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অশোক তাঁর গিরিলেখমালার ত্রয়োদশ অনুশাসনে দাবি করেছেন যে, তাঁর ধর্ম দেশ-বিদেশের বহু লোক গ্রহণ করেছিল এবং এর প্রভাবে সামাজিক কুপ্রথা ও বিভেদ দূর হয়েছিল। অশোকের দাবি সত্য হলে বলতে হবে তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

— ০ —